Journal of Cultural Research Studies, Vol-1 Issue-1(2022), p. 37-45
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

সতীনাথ ভাদুড়ীর দৃষ্টিতে অন্ত্যজ জীবন : ঢোঁড়াই চরিত মানস আখ্যানের প্রেক্ষিতে

রবীন্দ্রনাথ হাঁসদা

সহকারি অধ্যাপক , বাংলা বিভাগ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

Email : rabindranathhansda499@gmail.com

প্রাককথনঃ এখানে সতীনাথ ভাদুড়ীর কথাসাহিত্যের প্রেক্ষিতে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের অবস্থানের কথা আলোচনা করা হয়েছে। আমরা স্বাধীনোত্তর কালের বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের চালচিত্র বেশি করে পেয়ে থাকি। তবে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিশেষত মঙ্গল কাব্যেও আমরা এই শ্রেণীর মানুষদের পেয়েছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রথম দিকের বাংলা কথা সাহিত্যে সেভাবে এই শ্রেণীর মানুষদের আমরা পায় না। তারপর সময়ের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে বাংলা কথা সাহিত্যে অভিমুখ বদলে যেতে দেখেছি। আর সেটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের হাত ধরে । তাই বিশ শতকে এসে কল্লোল যুগের লেখকগোষ্ঠীদের আগমণে সাহিত্যে আমরা পালাবদল দেখে থাকি। এতকাল ধরে বাংলা সাহিত্য যে পথে চলতে অভ্যস্ত সেই চেনা পথে না গিয়ে এই যুগের লেখকেরা স্বতন্ত্র একটি পথ নির্মাণ করেন। তাদের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে শোষিত-বঞ্চিত-লাঞ্ছিত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের কথা উঠে আসে। সাহিত্যের দরবারে যারা এতকাল ধরে উপেক্ষিত ছিল এরপরে তারা এসে ভিড় জমাতে শুরু করে। এইভাবেই বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় সমাজ, সংস্কৃতির কথা উঠে এসেছে। তাদের জীবন-জীবিকার কথা, প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার এক অনবদ্য কাহিনি আমরা এই আখ্যানে পেয়েছি।

কথনঃ আমরা 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' আখ্যানে অন্ত্যজদের জীবন-জীবিকার কথা, লড়াই সংগ্রামের কথা পেয়ে থাকি। বৃত্তিবদলের উপাখ্যানের ধারায় এই রচনা জীবন্ত দলিল হয়ে রয়ে গেছে। যুগ-যুগান্তর কাল ধরে এদের সমাজ ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। এই ভাঙনকে এরা রোধ করতে পারে না। এই ভাঙাগড়ার খেলা কথাকারদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

সভ্যসমাজের মানুষ তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগিয়ে এই সমাজের মানুষদের অনাদরে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। এই সময়কালে আমরা গান্ধীবাদী রাজনীতির প্রাবল্য দেখেছি সারা দেশ জুড়ে। সেই ভাবধারার দ্বারাও আদিবাসী মানুষেরা অনুপ্রাণিত হয়ে দেশমুক্তির ডাকে সাড়া দিয়ে সেদিন আন্দোলনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল । প্রতিদানে ফাঁকি আর বঞ্চনা ছাড়া বিশেষ কিছু পাইনি। এই দলিত আদিবাসী মানুষদের নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করার অন্তিমে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে অন্ধকারের মধ্যে। অবশেষে তাদের ঠাঁই হয়েছে লোক চলাচলের অযোগ্য গ্রামের প্রান্তঃসীমায় অবস্থিত বনে-বাদাড়ে , মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত কোন জলাভূমি বা নদীর পাড়-পগাড়গুলিতে। সেইসব জায়গায় সাপ-খোপের সাথে লড়াই করে তাদের বসতি গড়ে তুলেছে। বেঁচে থাকার লড়াই জারি রেখেছে। অন্ত্যজদের সামাজিক দিক দিয়ে বঞ্চনার এই চিত্রটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে -----

''পুবদিকে গ্রামের বাইরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নেই। কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাহাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সবটুকু সমতলভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে। তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না। একটি কুঁড়ের আনাচে কানাচে তাহারই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতে আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। তারই ফলে জেলেপাড়াটি হইয়া উঠিয়াছে জমজমাট। '' (১)

স্বাধীন দেশে এইভাবেই এরা পরাধীন হয়ে জীবনযাপন করে চলেছে। সবদিক দিয়েই এরা আজ পরনির্ভরশীল বলা যায়। তবু এরা বেঁচে রয়। কোন রকমে দুবেলা-দুমুঠো খেয়ে পড়ে বেঁচে রয়েছে। এদের নিজের বলতে সত্যিই বিশেষ কিছু নেই। মাথা গোঁজার মত আশ্রয় আর নিজের গতর এটুকুই এদের একমাত্র সম্বল বলা যায়। না নেই ভিটে , না নেই মাটি। না নেই কর্ম সংস্থানের নিশ্চয়তা। ছলে বলে কৌশলে এই হতভাগা দেশে

এদের নিঃস্ব-সর্বহারা করে রেখে দেওয়া হয়েছে। আজ সব অধিকার কেড়ে নিয়ে যাদের দয়ার দানে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

বৃত্তিবদলের উপাখ্যান : এদের অভাব-অনটনের সুযোগ নানা সময়ে অসাধু মানুষেরা কাজে লাগিয়ে এদের ধর্মান্তরিত ও বৃত্তিবদলে সাথে বেগার খাটতে বাধ্য করে চলেছে। এই আখ্যানেও আমরা এই রকম প্রসঙ্গের কথা পেয়েছি। কথাপ্রসঙ্গে ধাঙড়দের অতীত ইতিহাস সূত্রে একথা জানতে পারি। যেমন ধাঙ্গড়দের পূর্বপুরুষ জাতিতে ছিলেন ওঁরাও। কবে তারা সাঁওতাল পরগনা থেকে গঙ্গার এপারে এসেছে কেউ বলতে পারে না। এখানে এসে তারা প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে তাদের নিজস্বতাকে বিসর্জন দিয়ে অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। কেন না তাতে খেয়ে পড়ে মাথা উঁচু করে বাঁচা যাবে। তাই এদের মধ্যে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা একটু বেশিই রয়েছে। ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে সংক্ষেপে একটা হিসাব দেওয়া হয়েছে :

''ভারতের জনসংখ্যার শতকরা সাড়ে পাঁচজন জন হলো আদিবাসী। আদিবাসীদের জনসংখ্যার ২০ ভাগের ১ ভাগ হলো খৃষ্টান। খৃষ্টান ছাড়া বাকী সমস্ত আদিবাসীই কমবেশী বৃহত্তর হিন্দু সমাজের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার অবস্থায় রয়েছে। একদিকে যেমন পুরোপুরি গোষ্ঠীগত (Tribal) পদ্ধতিতে জীবনযাপনের নিদর্শন দেখা যায়। এই দুই চূড়ান্ত অবস্থার মাঝামাঝি কমবেশী পরিবর্তিত ও হিন্দুত্বপ্রাপ্ত আদিবাসীদের একটা ক্রমবিন্যস্ত সামাজিক স্তরভেদ আছে। '' (২)

এদের মধ্যে বেশিরভাগই ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিশ্চান হয়ে গেছে। তবে বাকিরা নিজেদের হিন্দু পরিচয় দিতে ভালবাসে। আর হিন্দুদের সাথে মিশে গিয়ে হরিজন তকমা পেয়েছে। এইভাবে এরা নিজেদের জাত-ধর্ম খুইয়ে বসে আছে। যা কোনদিন আর ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না।

এই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদেরই বারে বারে টার্গেট করা হয়ে থাকে। সে ধর্ম-রাজনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই আমরা বঞ্চনার চিত্র দেখে থাকি। জোর করে ধর্মান্তরিত করা , জোর করে দলবদলে, জোর করে স্কুলছুট হতে বাধ্য করা হয়ে থাকে। তাৎমারা সমাজের অন্তেবাসী হয়েও তাদের মধ্যে কোন একসময়ে ধর্মত্যাগের হিড়িক দেখা যায়। সে

ইতিহাস আমরা এই আখ্যানের সূত্রে জানতে পারি। তাৎমারা কবীর পন্থ ও সৎনামি আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তাদের সামাজিক পদমর্যাদা বাড়িয়ে নেয়। তারা নিম্ন জাতীয় হিন্দু বা অস্পৃশ্য হয়ে দীর্ঘকাল নিম্নে থাকতে চায়নি। তারা উচ্চে উঠতে চেয়ে হিন্দুর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি অবলম্বন করতেও দ্বিধা করেনি। উপবীত ধারণ থেকে শুরু করে শিখাধারণ ও নিরামিষ ভক্ষণ কোন কিছুই বাকি রাখেনি। এইভাবে তারা তাদের মৌলিকত্ব বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল বলা যায়। ১৯২১ সালের বিহার-উড়িষ্যার সেন্সাস রিপোর্টে এ কথা স্বীকার করা হয়েছে যে --

'' **কবীর পন্থে ধর্মান্তরিত আদিবাসীদের চিন্তা ও জীবনযাপন প্রণালীতে বিশিষ্ট রকম উন্নতিমূলক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।** '' (৩)

এছাড়া সেই সময়ের ইতিহাস হতে আরও জানতে পারি -'পানকা নামে আদিবাসী সম্প্রদায়কে হিন্দু সমাজে অস্পৃশ্যের স্থান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কবীর পন্থের আশ্রয় গ্রহণ করে পানকা সম্প্রদায় স্পৃশ্য জাত হয়ে ওঠে, ঠিক যেমন ছত্রিশগড়ের অস্পৃশ্য চামার সম্প্রদায় সৎনামী আন্দোলনের আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেদের মর্যাদা উন্নীত করেছিল।' এই কাহিনি বাস্তবরূপ পেয়েছে এই আখ্যানে।

নিম্নবর্গীয়দের অবস্থান ও নানা ক্রিয়াকর্ম : অন্ত্যজদের সম্পর্কে আজও সমাজকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির খুব একটা বদল চোখে পড়ে না। তাদের সব ধরণের অধিকার কৌশলে কেড়ে নিয়ে দয়ার দানে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই শ্রেণীর মানুষেরা যাতে কোনদিন নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে না পারে। তার পাকা বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ না থাকার কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেছে। তাই এদের মধ্যে অনেকেই আজও দেশ বলতে জানে না , সংবিধান কী - তাও তারা বোঝে না , জানে না। এদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কিছু অসাধু মানুষ এদের পদে পদে বঞ্চিত করার কাজ দক্ষতার সাথে করে চলেছে। প্রতিনিয়ত নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চনা, পাওনা-গন্ডা বুঝে পাওয়া থেকে বঞ্চনা , ন্যায্য মজুরী পাওয়া থেকে বঞ্চনা করে চলেছে কিছু সুবিধাবাদী , স্বার্থপর মানুষেরা। তারা দেবোত্তর সম্পত্তির দোহাই দিয়ে সরকারি জমি একচেটিয়াভাবে ভোগ দখল করে চলেছে বংশ-পরম্পরায়। কখনো অলৌকিক গালগল্প বলে, কখনো পাপ-পুণ্যের দোহাই দিয়ে

অন্ত্যজদের ভয় দেখিয়ে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। তাই এদের জীবন জুড়ে ভয়ের রাজত্ব কায়েমিত রয়েছে।

এই ভয়ের পরিবেশ থেকে আজও বেরিয়ে আসতে পারেনি বলেই এরা বেঁচেও মরে রয়েছে। তাই এরা বশীকরণ , তুকতাক , তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস করে পড়ে রয়েছে। এই আখ্যানের সূত্রেই বৌকা বাওয়ারকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠতে দেখেছি। পাশাপাশি আবার ঢোঁড়াইকে নানা অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করতে দেখি। এই কাজে রেবন গুণীন তাকে সহায়তা করেছে। এদের জীবন জুড়ে গুণীন , ওঝা , ডাইনী , ডাকিনী , যোগিনী , পিশাচের ভূমিকা রয়েছে। এর বাইরে এরা কিছু ভাবতে পারে না। বা ভাবতে দেওয়া হয় না। কাজ কর , খাও-দাও আনন্দ কর এই নিয়েই এদের মাতিয়ে রাখা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এদের এই শিক্ষায় পুরুষাণুক্রমে দিয়ে চলেছে। তাই বশীকরণের মধ্য দিয়ে ঢোঁড়াই রামিয়াকে পেতে চেয়েছে। এদের জীবনে চাওয়া-পাওয়া খুব সামান্য। এদের জীবন জুড়েই রয়েছে নারী। ভিটে-মাটি , জমি-জমা , ধনসম্পত্তি এই নিয়ে এরা বিশেষ ভাবে না। এদের বাদ-বিবাদের মূলে রয়েছে সেই নারীই। নারীকে পেতে চেয়ে এরা কি না করে থাকে। যেমন ঢোঁড়াইকে করতে দেখেছি যাকে পাওয়ার জন্য সে এত কিছু করেছে তাকে সে ধরে রাখতে পারেনি। সে পরিণতির কথা না ভেবে রেবন গুণীনের খপ্পড়ে পড়ে এই কাজ করেছে। রেবন গুণীন তাকে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো বসিয়ে দেয়। তারপর বেদিটা থেকে খানিকটা মাটি ভেঙ্গে নিয়ে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে –

''যেই আমি মন্তর পড়ে গোঁসাই জাগাবো ওমনি দেখবি যে তুই হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করেছিস। একেবারে গাছের গুঁড়িতে গিয়ে ঠেকে যাবি, তবে থামবি। কারও বাপের সাধ্যি নেই তার আগে তোকে থামায়। '' (৪)

এই আখ্যানের সূত্রেই আমরা আর এক অন্ধ বিশ্বাসের পরিচয় জানতে পেরেছি। সেটি হল বাঁশগাছে দেখা দেওয়া ফুল । এরা বিশ্বাস করে এটা অশুভ বা অলক্ষণের সংকেত। তার অর্থ পাড়ায় বিপর্যয় নেমে আসতে চলেছে। সাবধান হতে না পারলে সমূহ বিপদ। তাই এখন কী করণীয় তার জন্য সালিশী সভা ডাকা হয়েছে । আর শনিচরা আর শনিচরার বৌকে পাড়া ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথাও জানিয়েছে পঞ্চজন। আগে কখনও যা হয়নি তা আজ বহু বছর পর দেখা দিয়েছে ।

''বাঙ্গাবাঙ্গির নির্দেশ আছে পাড়ার বাঁশঝাড়ে ফুল ফুটলেই বুঝবে যে আকাল , না হয় দুঃসময় কাছে। ঐ ফুলের ফসল ছেড়ো না। তাই দিয়ে রুটি তৈরি করে খাবে। তারপর বার বছরের বেশী, সেখানে থেকো না --- বার বার গাছে তেঁতুল পাকুক। তারপর তল্পিতল্পা গুটিয়ে , নতুন জায়গায় গিয়ে বসবাসের কথা ভাবতে হবে। '' (৫)

এই প্রসঙ্গে এবার এদের মোড়ল ব্যবস্থার কথা বলে নিতে হয়। এদের সমাজ বড় রক্ষণশীল। পুরুষশাসিত সমাজে পঞ্চজন কেন্দ্রিক যে সমাজ শাসন ব্যবস্থা কায়েমিত ছিল তাই বর্তমানে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই পঞ্চজনের প্রধানই মোড়ল নামে পরিচিত। এরাই সমাজে দন্ডমুন্ডের কর্তা। এরা যে নিয়ম-নীতিগুলি প্রণয়ন করে থাকে তার অন্যথা হবার জো নেই। এদের কথার অবাধ্য হওয়া মানে নিজের বিপদ ডেকে নিয়ে আসা। জলে বাস করে কুমীরের সাথে বিবাদ আর সমাজে থেকে মোড়লের সাথে বিবাদ দুই-ই এক। তার শাস্তি হয় ভয়ঙ্কর। পুরুষশাসিত সমাজের অবাধ্য হলে পড়ে তারা যে কি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ ---

''..... দুটো পাহাড়ি প্রেম --- হ্যাজাও এবং এটোঙা বর্শার ফলায় বিদ্ধ হয়ে বন্ধুর পাথুরে পথে আছাড় আছাড় খেতে খেতে নীচের দিকে নামতে লাগল। '' (৬)

পুরুষশাসিত সমাজে নারীর ভাল লাগা মন্দ লাগা মূল্যহীন। সামাজিক নিয়ম-নীতি , শাসন-অনুশাসন না মানলে পড়ে হত্যার মধ্য দিয়ে তারা প্রায়শ্চিত্ত করে থাকে।

এদের কাজ পাড়ার মানুষের বাদ-বিবাদের নিষ্পত্তি করা , পারিবারিক নানা অশান্তি নিয়ে মধ্যস্থতা করে দেওয়া। পাড়ায় কোন বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলেও এরা পঞ্চজনের দ্বারস্থ হয়ে থাকে। এই আখ্যানেও আমরা তিনবার পঞ্চায়েত বসতে দেখেছি। একবার পঞ্চজন মিলিতভাবে বৌকা বাওয়ারের ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দ্বিতীয়বার ঢোঁড়াইয়ের বিবাহ বিচ্ছেদের পক্ষে রায় দিয়ে ঢোঁড়াইকে শায়েস্তা করতে চেয়েছে। আর সবশেষে পাড়ায় বিপদের কালো ছায়া ঘনিয়ে এলে পরে পঞ্চায়েত বসেছিল। এদের সমাজে কেউ একটু অবস্থাপন্ন হয়ে উঠলে পঞ্চজন তাদের দেখতে পারে না। আমরা ঢোঁড়াইয়ের ক্ষেত্রে তা দেখেছি। লোক

সমাজে মোড়লদের মেনে না চললে যে কী করুণ পরিণতি নেমে আসতে পারে ঢোঁড়াইয়ের জীবন তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ ।

''যে সমাজের মাথাদের সে একদিনও নিঃশ্বাস নেওয়ার ফুরসৎ দেয়নি , সেগুলো সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল তার বিরুদ্ধে। ডালের মধ্যে মাছি পড়লে যেমন করে তুলে ফেলে দেয় আঙুলে করে , তেমনি করে তারা দূরে ফেলে দিয়েছে ঢোঁড়াইকে। '' (৭)

তারা চায় না গতে বাধা জীবনের বাইরে কেউ বেরিয়ে যায়। ঢোঁড়াই অন্য কিছু করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল বলেই চক্ষুশূলের কারণ হয়েছে। আর তাই তার সাথে পঞ্চজন এরকম করেছে। আমরা হাঁসুলি বাঁকের উপকথা আখ্যান হতে করালীর সঙ্গে একই রকম পরিণতির কথা জানতে পারি।

উপসংহারে এসে একথায় বলতে হয় , অন্ধকার জগতের অধিবাসী হয়ে আজও এরা পড়ে রয়েছে। এই জগতের মানুষেরা বিবাদ-কলহে , হানাহানি-মারামারিতে মত্ত থাকার কারণে বাইরের জগতের আর কোন ভাবনা এদের ভাবিয়ে তুলতে পারে না। এখান থেকে উত্তরণের খুব বেশি প্রয়াসও এদের মধ্যে দেখা যায় না। এইভাবে থাকতে থাকতে এরা দয়ার দানে বাঁচাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। মাথা উঁচু করে বাঁচাটা যে তাদের অধিকার সেটা আজ ভুলতে বসেছে। দেশের সম্পত্তির উপর ভোগ দখলের অধিকার তারা হারিয়ে বসে আছে। তবু তারা পরম নিশ্চিন্তে রয়েছে। বড় আমোদে রয়েছে। ভোগ সুখে মত্ত রয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি :

১) পদ্মানদীর মাঝি , মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় , গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স , ১৯৩৬ , কলকাতা , পৃষ্ঠা ৪

২) ভারতের আদিবাসী , সুবোধ ঘোষ , ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড , ১৯৪৮ , কলকাতা , পৃষ্ঠা ৯

৩) তদেব , পৃষ্ঠা ৩৪

৪) ঢোঁড়াই চরিত মানস , সতীনাথ ভাদুড়ী , বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , ১৯৬৩ , কলকাতা , পৃষ্ঠা ১১৪

৫) তদেব , পৃষ্ঠা ১৬২

৬) পূর্বপার্বতী , প্রফুল্ল রায় , বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , ১৯৪৮, কলকাতা , পৃষ্ঠা ৩০৯

৭) ঢোঁড়াই চরিত মানস , সতীনাথ ভাদুড়ী , বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , ১৯৬৩ , কলকাতা , পৃষ্ঠা ৩

সহায়ক গ্রন্থ

(১) রানা সন্তোষ ও রানা কুমার , পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী , ক্যাম্প , কলকাতা , ২০০৯

(২) বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ -আদিবাসী সমাজ ও পাল পার্বন , লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র , তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ , পশ্চিমবঙ্গ সরকার , ২০০১

(৩) বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ , গণ-আন্দোলনে সাঁওতাল সমাজ , মৈত্রী প্রকাশনী , ১৯৯৬

(৪) বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ , পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ , সুবর্ণরেখা কলকাতা , ১৯৯২

(৫) বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ , সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস , পার্ল পাবলিকেশন , কলকাতা ১৯৮৭

(৬) ঘোষ প্রদ্যোত , বাংলার জনজাতি , ১ ম খন্ড , পুস্তক বিপনী, কলকাতা , ২০০৭

(৭) সান্যাল তপন , বাংলা সাহিত্যে আদিবাসী রমণী ---পটভূমি ও ইতিবৃত্ত , বি বি প্রকাশন , কলকাতা ২০০০

(৮) ভদ্র গৌতম ও চট্টোপাধ্যায় পার্থ , নিম্নবর্গের ইতিহাস ,আনন্দ , কলকাতা , ১৯৯৮

(৯) চট্টোপাধ্যায় গায়ত্রী , তারাশঙ্করের উপন্যাসে শ্রমজীবী মানুষ , আশাবরী পাবলিকেশন , হাওড়া , ১৯৯৭

(১০) চৌধুরী কমল (সংগ্রহ ও সম্পাদনা) , সাঁওতাল বিদ্রোহ সমাজ ও জীবন , দেজ পাবলিশিং , কলকাতা ২০১১

(১১) সেন শুচিব্রত , পূর্বভারতে আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট , দেজ পাবলিশিং , কলকাতা ২০০৩

(১২) ঘোষ সুবোধ , ভারতের আদিবাসী , ইন্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ , কলকাতা , ১৯৪৮

(১৩) দেবসেন সুবোধ , বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ , পুস্তক বিপণি , কলকাতা , ২০১০

(১৪) দেবসেন সুবোধ , বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ , পুস্তক বিপণি , কলকাতা , ১৯৯৯

(১৫) দাস ড. অমলকুমার , মুখোপাধ্যায় শঙ্করানন্দ (সম্পা), পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী আন্দোলন , কলকাতা ১৯৭৭

(১৬) রায় হিমাংশুমোহন , ভারতের আদিবাসী , কলকাতা , ১৯৮০

(১৭) সেন গোপীনাথ , স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসীদের ভূমিকা , কলকাতা , ১৯৭৫

(১৮) সেন গোপীনাথ , পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী আন্দোলন , কলকাতা ১৯৭৭

(১৯) বন্দ্যোপাধ্যায় সুমহান , প্রসঙ্গ আদিবাসী , অফবিট পাবলিশিং , কলকাতা , ২০১২